সময়ের প্রেক্ষাপটে
রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ

জ্যোতির্ভূষণ দত্ত

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

গ্রন্থপ্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পরে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের সার্ধ শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত কর্মসূচির অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বেশ কিছু প্রবন্ধ সংকলন ও পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই ওই সকল গ্রন্থাদির কয়েকটিতে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা প্রবন্ধগুলি একত্রিত করে একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কিছু বন্ধুবান্ধব ও পাঠক পাঠিকা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁদের এই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমাকে বর্তমান সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশ করার ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলে। সেইসঙ্গে যুক্ত হয় স্নেহভাজন সন্দীপ নায়েক ও সপ্তর্ষি নায়েকের এ বিষয়ে সহৃদয় ইচ্ছা। প্রথমেই এঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে বহু মূল্যবান পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়েছে। এদের অনেকগুলির মধ্যে আছে ভক্তির প্রবল্য। আবার তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থাদির সংখ্যাও অনেক। বতর্মনা সংকলন গ্রন্থে ওইসব পুস্তাকাদি থেকে সংগৃহীত তথ্যাদিকে ভিত্তি করে একটি নিরপেক্ষ বিবরণ উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুই মনীষী রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে প্রকাশিত গ্রন্থাবলি ও প্রবন্ধাদির ভাণ্ডারে বর্তমানে গ্রন্থটি একটি অনাবশ্যক সংযোজন মনে হতেও পারে। কিন্তু শুধু ভারতবর্ষে নয় সমস্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে এই মনীষীদ্বয় ছিলেন প্রগতি ও মানবতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকবোধের সমন্বিত এক বিরল প্রেরণা, সমস্ত রকম সংকীর্ণতামুক্ত মানবমুক্তি সুনিশ্চিত করার এক অনন্য সাধারণ পথপ্রদর্শক। সুতরাং বার বার এঁদের কথা স্মরণ করতেই হবে। বর্তমানকালে নয়া বিশ্বায়ন-আক্রান্ত সমাজ সংসার, মূল্যবোধের নিদারুণ অবক্ষয়, মানব ঐক্যের পরিপন্থী জীবনপ্রবাহের বিবিধ চোরাস্রোত এবং ভোগবাদের পঙ্কিল ও অন্ধকার পথের হাতছানি থেকে মুক্তির আলোক রশ্মির সন্ধানে। পুনঃপুন এঁদের কথা মনে করতে হবে।

এই স্মরণ কাজে বর্তমান সংকলন গ্রন্থটি কোনোভাবে সহায়ক হলে কৃতার্থ বোধ করব।

জানুয়ারি ২০১৩

জ্যোতির্ভূষণ দত্ত

সূচিপত্র

রবীন্দ্রনাথ : প্রসঙ্গ জনশিক্ষা এবং শিক্ষার ভাষামাধ্যম	০৯
রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভাবনা এবং সাম্প্রতিক 'বিশ্বায়ন' প্রক্রিয়া	১৭
মানবিক শিক্ষার অতন্দ্র প্রহরী রবীন্দ্রনাথ	২৪
রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উদ্ধৃতি	৩৩
স্বামী বিবেকানন্দ : মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে	৩৫
বিবেকানন্দের সমাজভাবনার রূপরেখা	৫১
স্বামী বিবেকানন্দ : আধুনিক বাংলা গদ্যের সার্থক পথিকৃৎ	৬০
বিবেকানন্দের শিক্ষাভাবনা—বর্তমান সময়ে প্রাসঙ্গিকতা	৬৭
বিবকোনন্দের কয়েকজন বিশিষ্ট আমেরিকান শুভানুধ্যায়ী	৭৯
স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি উদ্ধৃতি	৯৪

রবীন্দ্রনাথ : প্রসঙ্গ জনশিক্ষা এবং শিক্ষার ভাষামাধ্যম

'রাশিয়ার চিঠি'-তে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, 'আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের ওপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য—সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে।' দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে শিক্ষার গুরুত্ব যে সব থেকে বেশি সেকথা আজও অনেকে স্বীকার না করলেও, রবীন্দ্রনাথ এই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি শুধু করেননি, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনের মাধ্যমে তাঁর সেই অনুভবকে বাস্তবায়িত করার জন্য আজীবন সক্রিয় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনার সঙ্গে শিক্ষাভাবনা সম্পৃক্ত হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবনদর্শন ও শিক্ষাদর্শন অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন—এ সবই দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ, দেশপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনার পরীক্ষাগার—কর্মী রবীন্দ্রনাথের কর্মযজ্ঞের পীঠস্থান।

শিক্ষাই জাতীয় জীবনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রাণদায়ী শক্তি। এই বিশ্বাস তাঁর এতটাই দৃঢ় ছিল যে তিনি মহাত্মা গান্ধির স্কুল-কলেজ বর্জন নীতিকে সমর্থন করতে পারেননি। আগে স্বরাজ পরে শিক্ষা, গান্ধিজির এই মত রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই মানতে পারেননি।

শিক্ষা প্রসারের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ সর্বজনীন জনশিক্ষাকেই অগ্রাধিকার দিতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, যে শিক্ষা কর্মসূচি কেবল সমাজের উঁচু স্তরের মানুষের জন্য আয়োজিত এবং বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে উদাসীন, সেই ব্যবস্থা কোনো সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে সক্ষম নয়। শুধু তাই নয়, ওই ব্যবস্থার ফলে সমাজ নিশ্চিতভাবে আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে দগ্ধ হবে।

অশিক্ষার অভিশাপ থেকে আপামর জনতাকে মুক্ত করতে হবে, তা না হলে অজ্ঞানতার অন্ধকার সমাজের সব স্তরের মানুষকেই পারস্পরিক সংঘাত ও বিদ্বেষের আঘাতে জর্জরিত করবে—এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক উপলব্ধি। তাই শ্রীনিকেতনে পল্লিউন্নয়ন কর্মসূচির অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার এবং

বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার কাজকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ১৯৩৩ সাল নাগাদ বীরভূমের সাঁওতালদের জন্য পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সমাজের অন্যান্য পিছিয়ে পড়া নিম্নবর্গের শিশুদের জন্য আরও পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯৩৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' বিষয়ে যে ভাষণ দেন তাতে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষার প্রয়োজনের বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য অবধারিতভাবে অনৈক্যের সূচনা করে। যার পরিণতিতে জাতীয় জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। দ্বন্দ্ব, সংঘাত, পারস্পরিক ঈর্ষা ও ঘৃণার বাতাবরণ সৃষ্টি করে। তাই 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ'-এ তাঁর বক্তব্য—'যে সমাজের এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে, অন্য বৃহত্তর অংশে শিক্ষাবিহীন, সে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত। সেখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মাঝখানে অসূর্যম্পশ্য অন্ধকারের ব্যবধান; দুই ভিন্ন জাতীয় মানুষের চেয়েও এদের চিত্তের ভিন্নতা আরও বেশি প্রবল।' রবীন্দ্রনাথের তাই উক্তি—'আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়। জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। বাংলাদেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে য়ুরোপ প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশির চেয়ে।'

রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় সর্বজনীন শিক্ষা এবং আমজনতার শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে কয়েকটি বাধা বিদ্যমান। এদের মধ্যে প্রধান বাধা এই যে শিক্ষার বাহনটা ইংরেজি।

'বিদেশি মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি-রফতানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যাবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।'

জাপান ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডার নিজের ভাষার মাধ্যমে আত্মীকরণ করেছিল এবং দেশের সকলের জন্য সেই জ্ঞানবিজ্ঞানের ফসল জাপানি ভাষার পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমেই পৌঁছে দিল। যদিও বাংলা ভাষা থেকে জাপানি ভাষার শব্দ সংখ্যা বেশি নয়। আমাদের দেশে কেউ কেউ বলেন যে গোড়ার দিকের সাধারণ শিক্ষাটা মাতৃভাষায় দেওয়া চলতে পারে কিন্তু উচ্চ শিক্ষার বাহন হিসেবে সেটা গ্রহণ করা সম্ভব নয় ও সমীচীনও নয়। সম্ভব নয় এই জন্য যে আমাদের মাতৃভাষায় লেখা অন্যান্য উন্নত দেশের জ্ঞান বিজ্ঞানের পুস্তকাদির বড়োই অভাব। কথাটা যদি সত্য বলে মেনেও নিই, তথাপি স্মরণে রাখতে হয় যে পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত হয় বাজারের নিয়মে। মাতৃভাষাকে সবস্তরে

শিক্ষার বাহন হিসেবে গ্রহণ করাটা মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার অবশ্যই পূর্ব শর্ত। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছেন, 'আমাদের এই ভীরুতা কী চিরদিনই থাকিয়া যাইবে। ভরসা করিয়া এটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম ইহতে যা কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দেশি ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।' বঙ্গদেশে শিক্ষার বাহন ইংরেজি হওয়া উচিত, এই নীতির সমীচীনতার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, 'যে বেচারা বাংলা বলে সে-ই কী আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চ শিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?'

স্বাধীনতার অধিকার পাইলে একটা জাতির অন্তর্নিহিত পৌরুষশক্তি বিকশিত হবার সুযোগ পায়। অনুরূপভাবে নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে পারে তার বৌদ্ধিক ও আবেগের উদ্ভাবনী মহিমা। ভাষা তো শুধু ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যম নয়, নতুন নতুন চিন্তা ও চেতনার জন্ম হয় এবং সমৃদ্ধতর বিকাশ ঘটে ভাষার জল ও মাটিতে এবং এই কাজটা মাতৃভাষায় উর্বর পলিমাটিতে যত সহজে ও সার্থকভাবে হয়, অন্যের ভাষায় ততটা হয় না। স্বভাষার উন্মুক্ত ও গতিশীল আশ্রয়ে বৃদ্ধি পায় আমাদের চিত্ত সম্পদ, সমৃদ্ধ হয় আমাদের বৌদ্ধিক সত্তা এবং সক্রিয় হয় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি স্বাভাবিক নিয়মে। আমরা হয়তো রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছি। কিন্তু এখনও নিজের ভাষার অধিকার লাভ করতে পারেনি, অদৃশ্য শত্রুর হাত থেকে সেই শক্তি কেড়ে নিতে পারিনি। নিজের মধ্যে আত্মগোপন করে যে সংস্কার ও মানসিকতা বন্ধুর ছদ্মবেশে শত্রুতা করে তার হাত থেকে সহজে নিস্তার পাওয়া যায় না। মনের এই সংস্কারকে অবশ্যই ঔপনিবেশিক দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

বিদ্যালয় স্তরেই যদি কারো অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে ইংরেজি ভাষা শেখার দুর্বলতা বা অনিচ্ছা দেখা যায় তবে তাকে ইংরেজি ছাড়াই অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ও সুযোগ দিতে হবে—এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক বাসনা। আর লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে তো তিনি ইংরেজি ভাষাতে শিক্ষা এবং এমনকি ইংরেজি ভাষা শিক্ষাকে অত্যাবশ্যক বলে তিনি মনে করতেন না। তাঁর প্রতিষ্ঠিত লোক শিক্ষা সংসদের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি বিশ্লেষণ করলে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়কে লোকশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিকল্পনা ও পরিচালনা করা হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সোপান হিসেবেই এর আয়োজন করা হয়েছিল এবং এর পেছনে অবশ্যই ক্রিয়াশীল ছিল তৎকালীন অভিভাবকদের চাহিদা। সেই কারণে ওখানকার শিক্ষাক্রম

থেকে ইংরেজি ভাষা বর্জনের অবকাশ রবীন্দ্রনাথের ছিল না। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়শিক্ষার স্তরে অবশ্যই প্রথম স্তরে নয়, ইংরেজি পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি পাঠদানের প্রচলিত অপরোক্ষ পদ্ধতি (The Direct Method) পালটে ছিলেন—বাংলাকেই করলেন ইংরেজি শেখাবার বাহন। কিন্তু বাংলা ভাষার সাহায্যে ইংরেজি পঠনপাঠনের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক তো ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে তাই ইংরেজি ভাষা পঠনপাঠনের জন্য মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্দেশ করে বেশ কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হয়। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের স্তরে ইংরেজি ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা ছিল, এ থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সঠিক নয় যে, রবীন্দ্রনাথ লেখাপড়ার শুরু থেকেই ইংরেজি ভাষা শেখানোর পক্ষপাতী ছিলেন। বরঞ্চ এর ঠিক বিপরীত কথাই তিনি বার বার ঘোষণা করেছেন।

বিদেশি শাসনাধীন ভারতে সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়ে বাহন ছিল ইংরেজি ভাষা এবং সে ভাষা শিখতে হত শিক্ষা জীবন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে। এই অনভিপ্রেত ব্যবস্থা চালু হয়েছিল ইংরেজ শাসকবৃন্দের ঔপনিবেশিক স্বার্থে। এর ফলে একদিকে দেশে জনশিক্ষার পথে প্রবল বাধার সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে দেশের অধিকাংশ লোক উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বলাই বাহুল্য, এই জাতীয় স্বার্থবিরোধী শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং বিদেশি শাসন ব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী হতে সাহায্য করেছিল।

বিদ্যালয় স্তরে রবীন্দ্রনাথের ভাষা শিক্ষার নিজস্ব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাঁর দুটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমটি—'অন্তত এগারো বছর বয়স পর্যন্ত আমার কাছে বাংলা ভাষার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।' উল্লেখ্য যে নর্মাল স্কুলে শিক্ষার পালা শেষ হবার এক বছর আগে তাঁর ইংরেজি শেখা শুরু হয়েছিল গৃহশিক্ষক অঘোরবাবুর কাছে। তখন তিনি ছিলেন বর্তমান হিসেবে বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ'—এ তার দ্বিতীয় উক্তি, 'ভাগ্যবলে অখ্যাত নর্মাল স্কুলে ভরতি হয়েছিলুম। তাই বুঝেছি, মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তারপর যথা সময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না।'

আমাদের দেশ যে স্বাধীন হয়েছে তা আজও সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারছি না। এর অন্যতম প্রধান কারণ আমরা ভাষার স্বাধীনতা এখনও অর্জন করতে পারিনি।। এছাড়া ঔপনিবেশিক ভারতের মতো এখনও শিক্ষাকে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রশিক্ষণ হিসেবেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং শিক্ষার সামাজিক ও মানবিক উদ্দেশ্যগুলিকে

প্রায়শ উপেক্ষা করা হয়ে থাকে। উন্নততর মানুষ হয়ে ওঠার গুণাবলি অর্জনের প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষাকে গণ্য করা হয় না। প্রকৃত মানুষ গড়ার শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে চিত্তশক্তিকে এবং দৈহিক শক্তিকে বিকশিত করে গ্রহণ করতে হয়। শুধুমাত্র উপার্জনের যন্ত্র হিসেবে অথবা দক্ষ উৎপাদনের উপাদান হিসেবে মানুষকে গড়ে তোলা নয়। মানুষের মানুষ হিসেবে এই বিকশিত হয়ে ওঠার জীবনচর্চা সংগঠিত করা কোনোমতেই শুধুমাত্র অন্যের ভাষার মাধ্যমে সম্ভবপর হতে পারে না এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের অবিচল বিশ্বাস।

কোন্ ভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা আমাদের দেশে দেওয়া প্রয়োজন—এই প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ যে স্বপ্নের কথা বলতেন সেটা নিম্নোক্ত উক্তি থেকে অনুমান করা যেতে পারে :

'ভালো ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কী প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না?

আমার প্রশ্ন এই, প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ত একরকম পড়াইয়া তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তা হইলে কী নানা প্রকারে সুবিধা হয় না। এক তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয় শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।

ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই বেশি লোক ঝুঁকিবে তা জানি; এবং দুটো রাস্তার চলাচল ঠিক সহজ অবস্থায় পৌঁছিতে কিছু সময়ও লাগিবে। রাজভাষার দর বেশি সুতরাং আদরও বেশি। কেবল চাকরির বাজারে নয়, বিবাহের বাজারেও বরের মূল্যবৃদ্ধি ওই রাস্তাতেই। তাই হোক, বাংলাভাষা অনাদর সহিতে রাজি, কিন্তু অকৃতার্থতা সহ্য করা কঠিন। ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক না কিন্তু গরিবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন।'

রবীন্দ্রনাথ যখন জনশিক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে বক্তব্য রাখছেন এবং নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করছেন, সেই সময় সমাজের এক শ্রেণির সুবিধাভোগী শিক্ষিত মানুষ সর্বজনীন শিক্ষার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করতেন। তাদের যুক্তি ছিল যে সবাই শিক্ষিত হলে কায়িক পরিশ্রম করা লোকের জোগানে ঘাটতি দেখা দেবে। এমনকি প্রয়োজনীয় সংখ্যক গৃহকর্মীও পাওয়া যাবে না। এই ধরনের মানসিকতা বর্তমানে নেই, এ কথাও কী জোর দিয়ে বলতে পারি? মনে রাখতে হবে ভারতীয় সংবিধানে ১৪ বছর পর্যন্ত শিশুদের ১৯৬০ সালের পর থেকেই সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য যে যে নির্দেশাত্মক নীতি ছিল সংবিধান প্রচলনের দীর্ঘ ৫০ বছর পরে ২০০০ সালে সেই বিষয়টির